International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 679-683
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss. v11.i4.094

জাতীয় জরুরী অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) বিপন্ন গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ

বিশ্বজিৎ খাঁন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বহরমপুর কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 01.07.2025; Accepted: 09.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The declaration of National Emergency in India during 1975–77, citing internal disorder as a threat to national security, marked a critical turning point and a dark period for Indian democracy and human rights. This essay analyzes various aspects of the Emergency. It explores the historical background of the Emergency, how fundamental rights under the Constitution were suspended during this period, the curtailment of press freedom, the suppression of opposition parties, and the challenges posed to judicial independence. The essay also explains how these actions affected civil rights, democracy, and human rights in the country. It highlights that the core foundation for protecting the Constitution, and the civil liberties, freedoms, and human rights of the people, lies in a strong and independent judiciary, freedom of the press, a responsible opposition, and a vigilant civil society. To prevent a repeat of such authoritarian and suffocating situations in the future, the essay emphasizes the need to strengthen constitutional safeguards, the rule of law, and democratic values.

Keywords: State of Emergency, Democracy, Humanism, Freedom, MISA

ভূমিকা:

স্বাধীন ভারতের গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার ও মানবাধিকারের ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় ছিল সমকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে ভারতে অভ্যন্তরীণ জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা, ২৫শে জুন, ১৯৭৫। বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অভাবনীয় সাফল্য তাঁর ও তাঁর কংগ্রেস দলের জনপ্রিয়তা অনেকটা বাড়িয়েছিল। কিন্তু অচিরেই ইন্দিরা গান্ধীর এই তুমুল জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিক থেকে তিনি রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হলেন। বিহার ও গুজরাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্যশস্যের গুরুতর ঘাটতি সংকটকে তীব্রতর করে তোলে। বাংলাদেশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের বাসস্থান ও ভরণপোষণের দায়িত্ব ভারত সরকারকে নিতে হওয়ায় তা আর্থিক সংকটকে তীব্রতর করে তোলে। তার উপর আবার ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি করে ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁর সাংসদপদ বাতিল হয়। এতে দেশের রাজনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পায় এবং সরকার বিরোধী দলগুলির তীব্র বিক্ষোভ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। এই সংকট মোচনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী এক অ-গনতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আঘাত করেন এবং জনগণের মানবাধিকার হরণের পথ বেছে নেন। জনগণের সাংবিধানিক অধিকারে আঘাত হানেন। এই স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রতিফলন ও পরিনতি ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন ঘোষিত জরুরী অবস্থা। জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সংবিধানে ভারতীয় জনগণের জন্য যে মৌলিক অধিকারের ব্যাবস্থা

রয়েছে তা বাতিল করেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, জনগণের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়, জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, জোরপূর্বক পুরুষদের নির্বীজকরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়, বিনা কারণে পুলিশী নির্যাতন বৃদ্ধি পায়।

১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে তীব্র আর্থিক সংকট ভারতকে গ্রাস করতে থাকে। অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যশস্যের গুরুতর ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের চাপ ভারত সরকারকে বহন করতে হয়েছিল। এর ফল ছিল ব্যাপক বাজেট ঘাটতি। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় ভারতের নানা প্রান্ত খরার কবলে পড়ে। দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় চারগুণ বাড়িয়ে দেয়। দেশজুড়ে অত্যাবশ্যকীয় পন্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেল। দরিদ্র ও মধ্যশ্রেণীর মানুষ এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হলেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সাল নাগাদ মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ২২ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধি খাদ্য পন্যের জোগান ব্যাহত করল। ভারতের নানা প্রান্তে খাদ্য দাঙ্গা দেখা দিল।[১] বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক মন্দার কুপ্রভাব শিল্পক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হলে। ১৯৭২-৭৩ সাল জুড়ে বিভিন্ন শিল্পে ধর্মঘট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শিল্পাঞ্চল গুলিতে শ্রমিক বিক্ষোভের পূর্ণ পরিনতি লক্ষ্য করা গেল ১৯৭৪ সালের মে মাসে দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটের মধ্যে।[২]

ভারতের নানা প্রান্তে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গুজরাত ও বিহারের বিক্ষোভ আন্দোলন। গন্ডগোলের সূচনা গুজরাতে। তখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চিমনভাই প্যাটেল নামে এক দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসী নেতা। রাজ্যের লোকের কাছে তিনি 'চিমন চোর' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[৩] ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে চিমনভাই প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার দাবিতে গুজরাটে 'নব নির্মান' নামে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ব্যাঙ্ক লুট, সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সবকিছুই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে প্রতিভাত হয়।[৪] আন্দোলন দমনের নামে রাষ্ট্রীয় দমন নীতির পরিণামে শতাধিক মানুষ নিহত হন, ৩০০০ এর বেশী মানুষ আহত হন এবং ৮০০০ প্রতিবাদীকে গ্রেফতার করা হয়।[৫]

বিহারের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, স্বজনপোষণ, জাতপাতের বৈষম্য, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি প্রভৃতি নানা কারণে ছাত্র যুবারা আন্দোলন বিক্ষোভের পথে যেতে বাধ্য হন। ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।[৬] ১৯৭৪ সালের ২১ শে জানুয়ারি লালুপ্রসাদ যাদবের সভাপতিত্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কংগ্রেস বিরোধী ছাত্রদের একটি সম্মেলনের পরিণতি হিসেবে ১৮ ই ফেব্রুয়ারী বিহারে 'ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি' গঠিত হয়।[৭] ১৮ ই মার্চ 'ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি' বিহার বিধানসভায় পদযাত্রার কর্মসূচি নিলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পাটনা শহরের আইন শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।[৮] পুলিশী নির্যাতনে বহু ছাত্র আহত হন ও তিন জন ছাত্র মারা যান।[৯]

এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন গান্ধীবাদী, কংগ্রেস সোসালিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ন। তার নেতৃত্বে শুরু হয় JP আন্দোলন, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলে। কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেও পারস্পরিক সন্দেহ, বাদানুবাদ ও অবিশ্বাসের কারণে আলোচনা ভেস্তে যায়। জয়প্রকাশ নারায়ন পাটনার জনসভায় পুলিশী নির্যাতনের শিকার হলে ঘটনাটা দেশের মানুষ ভালো ভাবে নেয়নি। জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, সমাজবাদী দল, আকালি দল সবাই জয়প্রকাশের আন্দোলনে হাত বাড়িয়ে দেয়। আন্দোলন ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও ইন্দিরা বিরোধী মত শোনা যেতে থাকে।

এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১২ ই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহন লাল সিংহ তার রায়ে জানান যে, ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে রায় বরেলি সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বিরোধী প্রার্থী সমাজতন্ত্রি দলের রাজনারায়ণ কে পরাজিত করেছেন। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করা হল এবং বলা হল আগামী ছয় বছর তিনি লোকসভার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। অর্থাৎ তিনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না।[১০] ইন্দিরা গান্ধী এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলে

বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার রায় দেন, যতক্ষণ না একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে বিষয়টির মীমাংসা হচ্ছে, ততক্ষণ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, সংসদে বক্তব্য রাখতে পারবেন, কিন্তু ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারবেন না।[১১] বিরোধী দলগুলি তার পদত্যাগের দাবিতে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু তিনি তার ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধী এবং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পরামর্শে পদত্যাগ না করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন একটি অর্ডিন্যান্সের খসড়া তৈরি করেন[১২] এবং মধ্যরাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের স্বাক্ষর করান এবং রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা বলে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। বলা হল ২৬শে জুন সকাল থেকে এই ঘোষণা কার্যকর হবে।[১৩]

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এই অজুহাতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এই জরুরি অবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে সরকার অ-গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী জনবিরোধী একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের মৌলিক অধিকার বাতিল করে, MISA (Maintenance of Internal Security Act) প্রয়োগ করে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, জমায়েতের অধিকার বাতিল করা হয়। তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার ও গুজরাটের জনতা সরকারকে অন্যায় ভাবে বরখাস্ত করা হয়। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী এনে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল রিভিউ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবার পর দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগকে অসম্ভব শক্তিশালী করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের মৌলিক গণতান্ত্রিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হলো। ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালানো হয়। সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা যথা মত প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমবেত হবার ও সভা সমিতি করার অধিকার ইত্যাদিকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের এই অধিকার ও স্বাধীনতা গুলিকে বাতিল করা হলো। আইনের শাসন তুলে দেওয়ার প্রয়াসের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার গুলিতে হস্তক্ষেপ করা হয়। যেকোনো রকম সরকারবিরোধী প্রতিবাদ অবৈধ বলে ঘোষিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় কঠোর দমননীতির মাধ্যমে সেগুলিকে দমন করা হয়। রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধী সরকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার অধিকার বাতিল করে দেয় (অনুচ্ছেদ ২২)। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয় (অনুচ্ছেদে ২১)। ২৬শে জুন সকাল বেলা বহু সংখ্যক প্রখ্যাত বিরোধী নেতাদের MISA প্রয়োগ করে কারারুদ্ধ করা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মুরারজি দেশাই, চৌধুরী চরণ সিং, অশোক মেটা, অটল বিহারী বাজপেয়ি এবং প্রায় ৩০ জন সাংসদ। এই সাংসদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর ও মোহন ধারিয়ার মত বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা। অসংখ্য সাংবাদিক, ছাত্রনেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।[১৪] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করতে সংবাদপত্র অফিসের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।[১৫] সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর লাগামহীন আগ্রাসন চালানো হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে গ্রেফতার করা হয়।[১৬] জরুরি অবস্থার সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। আর এস এস, জামাত-ই- ইসলামী, আনন্দমার্গ ইত্যাদি সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। MISA এবং Defence of India Rules-DIR প্রয়োগ করে বিনা বিচারে এক লক্ষ দশ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।[১৭] ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তার বার্ষিক প্রতিবেদনে লিখেছিল

> "The MISA and DIR had been used extensively to detain peaceful opponents of the government, after the declaration of national state of emergency on 26 June 1975."[১৮]

নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কে অকেজো করে দেয়া হয়। রাজ্য সরকার গুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার ও মার্চ মাসে গুজরাটের জনতা সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। এইভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজ্য সরকার গুলিকে বাতিল করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চরম আঘাত করা হয়। কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বলেও কিছু ছিল না, সঞ্জয় গান্ধীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] নতুন নতুন

আইন প্রণয়ন করে এবং সংবিধান সংশোধন করে ক্রমাগত বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। প্রশাসনের উপর বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়। জরুরী অবস্থার সময়ে ভারতের গণতন্ত্রের অন্তর্জলী যাত্রা ঘটেছিল। সঞ্জয় গান্ধীর নির্দেশে দিল্লি পৌরসভা ও দিল্লি উন্নয়ন পর্ষদ দিল্লির সৌন্দর্যায়নের জন্য জামা মসজিদ ও তুর্কমান গেট সংলগ্ন বস্তি গুলির প্রায় দেড় লক্ষ নির্মাণ ভেঙে ফেলে এবং ৭ লক্ষ মানুষকে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে। উৎখাত খাওয়া মানুষদের তড়িঘড়ি দিল্লির উপকণ্ঠে নতুন তৈরি হওয়া কলোনি গুলোতে স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও সেখানে পানীয় জল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব ছিল।[২০]

১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করে দেশের জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৫ থেকে কমিয়ে ২৫ করার পরিকল্পনা করে ১৯৮৪ সালের মধ্যে। এই উদ্দেশ্যে সঞ্জয় গান্ধীর উদ্যোগে শুরু হয় বলপূর্বক নির্বীজকরণ বা নাসবন্দি। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ৩৭ লক্ষ ভারতীয়র বলপূর্বক নির্বীজকরণ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আদিবাসী, দলিত, মুসলিম ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ। সরকারি কর্মচারীরা দুর্বল শ্রেণীর সাধারণ মানুষদের জোর করে বাস ট্রেন ও অন্যান্য যাত্রীবাহী পরিবহন থেকে নামিয়ে নিকটস্থ নির্বীজ কেন্দ্রে নিয়ে যেত। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতায় ক্ষুব্ধ মানুষ প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী সহিংস দাঙ্গা শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। জনগণের মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়।

১৯৭৭ সালের ১৮ই জানুয়ারি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আচমকা সংসদ ভেঙে দিয়ে ঘোষণা করেন মার্চ মাসে লোকসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯শে জানুয়ারি মোরারজি দেশাই এর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসংঘ, লোকদল, সমাজতন্ত্রী দল এবং মুরারজি দেশাইয়ের নিজের সংগঠন কংগ্রেস (ও) - এই চারটি দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ঘোষণা করে তারা একটি অভিন্ন প্রতীক নিয়ে একটাই রাজনৈতিক দলের নামে নির্বাচনে অংশ নেবে। ২৩শে জানুয়ারী গঠিত হয় জনতা দল। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জনতা দল ৫৪২ টি আসনের মধ্যে ৩৩০ টি আসন লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৩শে মার্চ মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সেই সঙ্গেই শেষ হয় ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অধ্যায়ের।

১৯৭৫-৭৭ সালের জাতীয় জরুরি অবস্থা ভারতের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উপর গভীর এবং বহুমুখী প্রভাব ফেলেছিল। এটি ছিল ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়, যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বলতা, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার সংকটকে প্রকট করে তুলেছিল। জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ওপর দমনপীড়ন চালানো হয়েছিল এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। এসব ঘটনার প্রভাব ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। ১৯৭৫-৭৭ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে, যখন সরকার অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে এবং জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে, তখন গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সংবিধানের আওতায় যে সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, সেগুলোর কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার ব্যবস্থা যদি সরকারের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত প্রতিহত করা সম্ভব হবে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। জরুরি অবস্থার সময় সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল, যা গণতান্ত্রিক তথ্যপ্রবাহকে ব্যাহত করেছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচিত, যাতে জনগণ সঠিক তথ্য পায় এবং সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারে। রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ ছিল। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা অপরিহার্য। শক্তিশালী বিরোধী দল, কার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার মাধ্যমে গণতন্ত্র আরও সুসংহত হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নাগরিকদের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি করা। শিক্ষা ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে

ওঠে। একই সঙ্গে, নাগরিক সমাজ ও সামাজিক আন্দোলনগুলির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

সর্বোপরি, ১৯৭৫-৭৭ সালের জাতীয় জরুরি অবস্থা ভারতের গণতন্ত্রের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে আছে। এটি প্রমাণ করেছে যে, গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকতে পারে যখন জনগণ সচেতন, প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী এবং মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে। ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোকে আরও দৃঢ় করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., Panikkar, K. N., & Mahajan, S. (2000), India after independence: 1947 to 2000. Penguin Books. pp. 246-247.
2. Samantha, R. (2016). Crisis of 1974: Railway strike and the rank and file, Sage Publications, (passim).
3. Guha, R. (2007), India after Gandhi: The history of the world's largest democracy, HarperCollins, p. 477.
4. Shah, G. (1977), Hottest moments in the Indian state: A study of the Gujarat and Bihar movements, Popular Prakashan. p. 48.
5. Chandra, B. (2003). In the name of democracy: JP movement and the emergency, Penguin Books, p. 37.
6. Chandra, B. (2003), In the name of democracy: JP movement and the emergency, Penguin Books. pp. 38-39.
7. Chandra, B. (2003), In the name of democracy: JP movement and the emergency, Penguin Books, p. 39.
8. Shah, G. (1977), Hottest moments in the Indian state: A study of the Gujarat and Bihar movements, Popular Prakashan. p. 40.
9. Guha, R. (2007), India after Gandhi: The history of the world's largest democracy, HarperCollins, p. 478.
10. The Statesman, (1975, June 13).
11. Frankel, F. R. (2005), India's political economy: 1947-2004, Oxford University Press, p. 543.
12. Guha, R. (2007), India after Gandhi: The history of the world's largest democracy, HarperCollins. p. 491.
13. Guha, R. (2007), India after Gandhi: The history of the world's largest democracy, Harper Collins. p. 493.
14. Chandra, B. (2003), In the name of democracy: JP movement and the emergency, Penguin Books, pp. 156-157.
15. Nayar, K. (1977), The judgement: Inside history of emergency in India, Vikas Publishing House, p. 36.
16. Nayar, K. (2015, June 8-14), Flexing the muzzle, The Week, 33(24), 58-59.
17. Chandra, B. (2003), In the name of democracy: JP movement and the emergency, Penguin Books, p. 157.
18. Amnesty International. (1977), Amnesty International Report 1977, Amnesty International Publications, p. 197.
19. Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., Panikkar, K. N., & Mahajan, S. (2000), India after independence: 1947 to 2000, Penguin Books, p. 254.
20. Frankel, F. R. (2005), India's political economy: 1947-2004, Oxford University Press. p. 562.